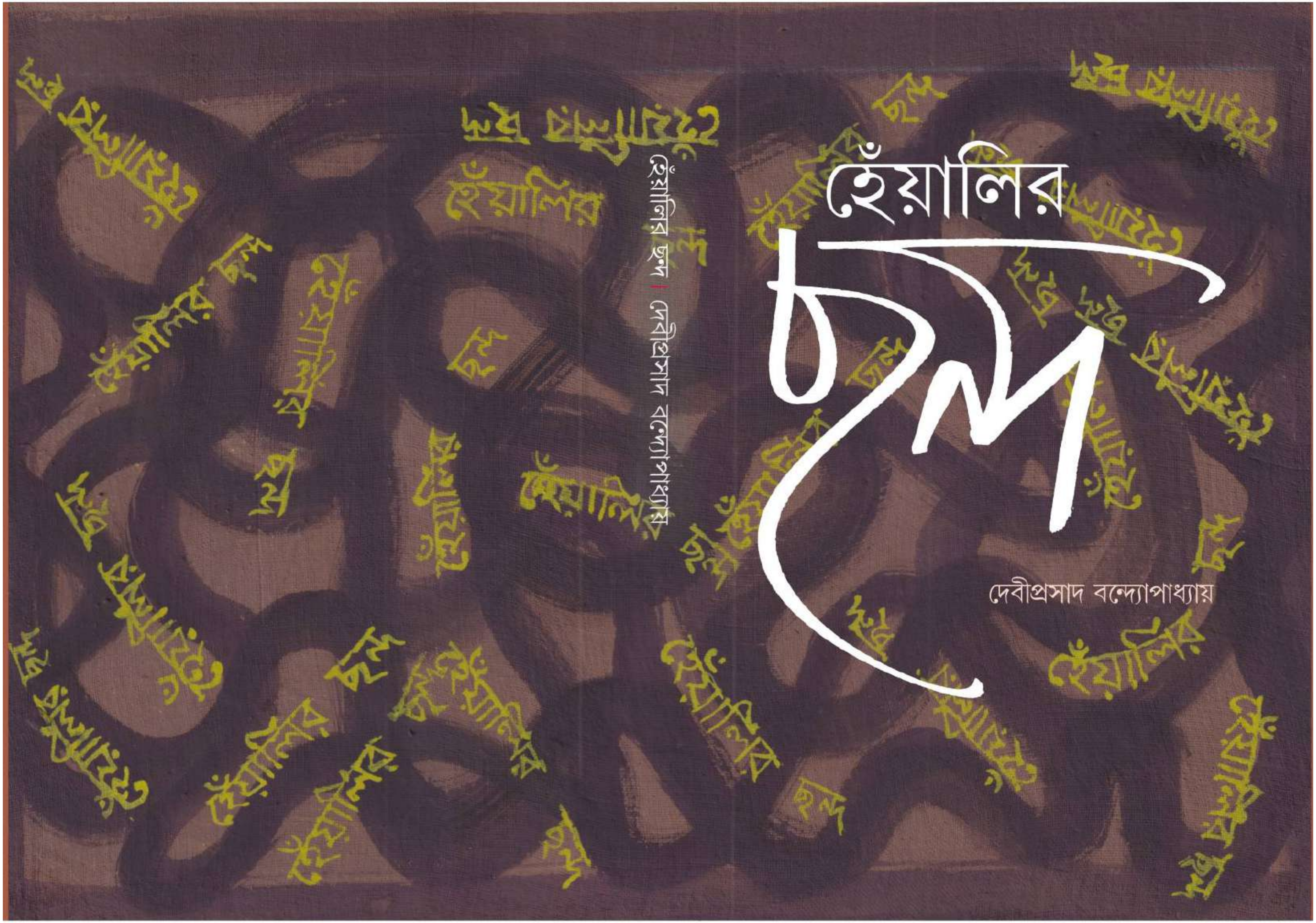

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেঁয়ালির ছন্দ | দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থমালা ১

হেঁয়ালির ছন্দ

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি

স্বপ্না সেন

শামা

HNEALIR CHHANDA
by Deviprasad Bandyopadhyaya

Published by Shama Bandyapadhyaya
SHAMA
80 Gangapuri, Purba Putiary, Kolkata 700093, Mobile 9122333433 | 9903047388
Distributed by
The Shee Book Agency
201A,Muktarambabu Street, Kolkata 700007, Mobile 9874168470
thesheebookagency@gmail.com

স্বত্ব : বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ বইমেলা ২০০১
দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭
প্রথম শামা সংস্করণ মহালয়া, সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদের নামাঙ্কন প্রণবেশ মাইতি

শামা পাবলিকেশনসের-র পক্ষে ৮০ গঙ্গাপুরী, পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা- ৭০০০৯৭ থেকে
শামা বন্দ্যোপাধ্যায় (৯১২২৩৩৩৪৩৩/৯৯০৩০৪৭৩৮৮) কর্তৃক প্রকাশিত এবং
কমলা প্রেস, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য তিনশো টাকা

উৎসর্গ

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

আ র ম্ভে র আ গে

মহাভারতকার তাঁর আঠারো-পর্ব কাব্য বলবেন মুখে মুখে, গণেশ ঠাকুর লিখে তুলবেন পুঁথি করে— এই ছিল কথা। কিন্তু যদি বলায় ছেদ পড়ে একবারও? গণেশ বললেন, তখুনি ইতি বলে উঠে পড়বেন তিনি পুঁথিপাটা ছেড়ে। তাই সই। তবে ঠাকুর, একটা ধারা জোড়া হোক— মাছিমারা নকল চলবে না, প্রত্যেকটি কথা বুঝেপড়ে তবে লিখতে হবে। কিংবদন্তিতে পাই, তাইতেই মহাভারতের দশ পা না চলতে এত কূট আর হেঁয়ালি শ্লোকের ছড়াছড়ি। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কবিপণ্ডিত হলেন ব্যাসদেব, তাঁর কথার জট ছাড়িয়ে গণেশঠাকুরকেও রয়ে বসে এগোতে হয়, আর সেই ফাঁকে এগিয়ে চলে লেখা।

মহাভারতের সমস্যা হল সামাজিক মানুষের ভালোমন্দের সব সমস্যা। সে হল জ্ঞানের পরীক্ষা আর জানার তত্ত্ব। কত মতো সে তত্ত্ব। ঢেকে ছেপে হেঁয়ালি ক'রে এমনি জানার কথা বলার প্রথা ঘরে ঘরে, সর্ব দেশে। লোকের মুখে, লেখার ছত্রে তার নমুনাও জমে আছে অনেক। বৌদ্ধদের এক গল্পে পাই, মেয়ে শ্বশুরঘর করতে যাবার কালে বাবা উপদেশ দিচ্ছেন : ঘরের আগুন বাইরে নিয়ো না, বাইরের আগুন ঘরে নিয়ো না; যে দেয় তাকে দিয়ো, যে না দেয় তাকেও দিয়ো, ইত্যাদি। কী অর্থ তার? মেয়ে বুঝলে নিশ্চয়। উপনিষদের লেখাতে আছে, দেব অসুর নর প্রজাপতির তিন ছেলে বাবার কাছে উপদেশ চাইলে তিনজনকেই বাবা বললেন, দ দ দ— যে যার নিজের মতো অর্থ বুঝে নিলে। মহাজনের মহাজ্ঞানের কথার অর্থ তো এমনিই লোকে বুঝে পায়। আমাদের খনার বচনে নিছকই গেরস্থালির সব জ্ঞান, তার একটিতে পাচ্ছি : আঘনে পৌটি, পৌষে ছেউটি, মাঘে নাড়া, ফাল্গুনে ফাঁড়া। কেমন হল? নাও, যে বোঝো সে বোঝা। পুরোনো গানের পদ মনে পড়ছে :কোন্‌খানে রয়েছে আমার বিনি ধানের খই রে, বিনি ধানের খই...'। কী সে ? বাইশ বাজারে সাজা পেতে গেল নিদ্দুষি লোকে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির খোঁজে বোনা পড়ছে রূপকথার গল্পে— উত্তর জানার আগে গায়ে কাঁটা লাগে। আবার পুরোনো বিলিতি রহস্যের বইতে পাচ্ছি : ছাগল আর ভেড়ার তফাত বুঝব কিসে? হাক্ ফিনের গল্পে প্রশ্ন দেখছি, মোম নিবে গেলে পরে কোথায় রইলেন তখন হজরত মুসা? কিছুতে কোন্ জল জমবে না? এ হল ঠাট্টার রহস্য। হেসে বলতে হয়, কেন, দেখে! গরম জল, আবার কী! কেন মোম নিবলে পর মুসা রইলেন অন্ধকারে!

গা-ছমছম আর হাসাহাসি এই দু-দিকেই হেঁয়ালির চলা। হয়তো আরো ঘন চলাচল কেননা নানা দেশে সে প্রশ্নোত্তরের একটা খেলাও বটে। কিন্তু হেঁয়ালি ইতিহাসের আর একটা ভাগ আছে তাতে বাধ্যতা, বা নির্বন্ধ— মুখোমুখি না হয়ে নিস্তার নেই। এমনি একটু নমুনাও সরাসরি আছে মহাভারতেই, যক্ষপ্রশ্ন অধ্যায়ে। দ্বৈত বনে থাকার কালে পিপাসায় অস্থির হয়ে বনবাসী পাণ্ডবেরা গেছেন জলের খোঁজে। পথে পড়ল বিমল সরোবর, কিন্তু তার পাড়ে বসে এক বক পাখি, বলছে, আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তবে যাও জল স্পর্শ করো। পাখির কথা কে শোনে। হেঁয়ালিতে কান না ক'রে জল খেতে গিয়ে মরে পড়লেন একে একে নকুল সহদেব অর্জুন ভীম চার মহারথী। তখন এলেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। এ তো পাখি পাখি নয় তবে। সত্য তুমি কে? বলতে বলতে পাখি হয়ে দাঁড়াল পাহাড়-পর্বতের মতো বিপুলকায়, সূর্যাগ্নির মতো তীব্র রূপ এক যক্ষ। তার প্রশ্ন, যুধিষ্ঠিরের উত্তর আমরা ২৮৪ সংখ্যা হেঁয়ালিতে লিখে দিয়েছি।

পুরোনো লেখাতে এই রকমের নির্বন্ধকারী যক্ষের লেখা আছে অনেক জায়গাতে। জাতকের গল্পে আছে নরমাংসাশী এক যক্ষের পরাজয় করেছিলেন বোধিসত্ত্ব। কালিদাসের গল্পে ভোজরাজা তাঁর নতুন পুরীতে ঢুকতে পেলেন দখলদার ভয়ানক এক যক্ষের সমুচিত উত্তর দিয়ে কালিদাস তাকে বিতাড়ন করলে পরে। নির্নিমেষ রক্তাক্ষি যক্ষীদের কথাও আছে জাতকে। বোধ করি এমনই এক যক্ষী গ্রীক পুরাণের মানুষাশী স্ফিংকস্, গ্রীকদের আগের থাকতেই সীরিয়ান ফিনিশিয়ান এবং পুরোনো মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে বহু হত্যা করেছে ব্যর্থ সমাধানহীনদের; কিংবদন্তি, মহাকবি হোমারেরও মৃত্যু জবাব দিতে না পারার লজ্জায়। রাজপুত্র অয়দিপসের হাতে তার হার হল, মৃত্যুও হল। পরের দিনে গ্রীক কবিরা তাকে উল্লেখ করেছেন প্রজ্ঞাকুমারী বলে— গান গেয়ে বেড়ায় দৈব বিধানের আর হেঁয়ালির সব গান। অয়দিপস্‌কে সে যা প্রশ্ন

করেছিল তাতে বিশিষ্ট উদ্ভাবনা নেই, সে হল সাধারণ জ্ঞানের, বা সর্বজনীন লোকস্মৃতির কথা— মানুষের তিন কাল নিয়ে এই হেঁয়ালি পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই অনুরূপ ভাবে-বিন্যাসে মিলেছে। কিন্তু তার প্রশ্নের ধারাতে যা লক্ষ্য হয় তা হল, এই সব সামান্য জ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষাতে পাশ না হলে মানুষের ঢোকার অধিকার নেই তার আপন বাড়ি, বা তার উদ্দিষ্ট পুরীনিকেতনে।

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোক্‌লোর-বিদ্যা তার বিপুল উপকরণের একটা বড়ো ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য। তাইতে বড়ো কবিও নানা দেশে নানা কালে ঝুঁকেছেন হেঁয়ালির পদ্য যত্ন করে লিখে তুলতে। কিন্তু সে সযত্ন রচনা কয়টি বাদ দিয়েও হেঁয়ালিতে বলার বিষয় আছে ভাষার প্যাঁচে জড়িয়ে— ধাঁধা ভাঙাও তো, পারো ভাঙাও তো— পারলে তবে মান্য ব'লে তোমার প্রতিষ্ঠা। মান্য লেখা আর লোকমুখের সমস্যাও অনেক ক্ষেত্রে এক ধারা। প্রসঙ্গত, এ বইয়ের ১২৯ সংখ্যা ধাঁধাটির মতো জাতককাহিনীর অমরাও বলেছিল, "যদি আসে তো আসব না, যদি না আসে তবে আসব।" তার বলবার অবশ্য বৃষ্টি নয়, বান। কিন্তু হেঁয়ালি করে বলা যেন একটা আলাদা কুশলতা— লোকের, বৃহতেরও সম্ভ্রম হয় তাতে। এক কালে মানুষের পরম উপায় ছিল তার ভাষা, তার বুদ্ধির বিবেচনার কল্পনার পরীক্ষা যেন আগে সেই ভাষার কাছে। তখনও বিজ্ঞানের মনুষ্যআবেগরিক্ত গাণিতিক ভাষা ঠিকমতো তৈরি হয়ে ওঠে নি।

হেঁয়ালি একটা ছোটো বিবরণ, কিন্তু নিঃসম্পর্ক, এমনকি বিপরীত তুলনা লিখে বাঁধা বলে তার গড়া ভাঙা দু তরফেই কবিকল্পনা রয়েছে মুখ্য স্থানে। একটা কথার চলতির উপরে তির্যক্ তার ব্যবহার, তাই তার মানে ব্যুৎপত্তির চাইতে ব্যঞ্জনা-গত, তার অর্থবোধ, সমস্যাভেদও কল্পনারই কৌশলে। বিশ্বচরাচরের বিস্ময়, আর সুসমাজের সদাচার নিয়ে তার প্রথম লেখা ছড়িয়ে আছে আবিশ্ব— ধ্রুপদী শাস্ত্র কাব্যের পাশাপাশি বিস্তারবিমুখ আদিমানুষের মণ্ডলীতেও একইভাবে আকাশের সূর্য-তারা-গ্রহাণুগ্রহ, চারিপাশের পশু-প্রাণী-প্রকৃতি বন্ধন, ঘরের ফল-ফসল-গৃহস্থালি, আর নিজের জীবন ও ধর্মবোধ নিয়ে অবধান সে জড়িয়ে দিয়েছে হেঁয়ালিতে। জ্ঞানী ঋষি দেখছেন প্রতিদিন শূন্যপথে দুনিয়া ঘুরে আসা এক রাখালকে, কে সে রাখাল যার আগুন জ্বলছে পরনের কাপড়ে, আগুন খসে খসে যাচ্ছে সারা পথ? বলছেন, বলো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কী চাষির? না, যে চষে বর্ষণ চায়, যে রোয় সে চায় ভালো বীজ। ধর্ম লাভ করতে হলে ছাড়তে হয় চারটি বস্তু, কী? অজ্ঞান গর্ব আলস্য দুঃখ। এ প্রশ্নোত্তর আজকে ক্যুয়িজের মতো যেন, যদিও তথ্যজ্ঞানের চেয়ে গভীরতর নীতিজ্ঞান-এর বিষয়। পুরোনো যজ্ঞস্থলীতে দুই ঋষি বসতেন এই সব সত্যের জিজ্ঞাসা আর সমাধানে। এই মন্ত্রোপম হেঁয়ালিই আবার তুক্ করার, বশ করার, বধ করার, আরোগ্য করার জাদু বলে কাজে লাগত ডাকিনীতন্ত্রে— ভারতীয় যক্ষ আর যবনী যক্ষীর এমন দুটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের কথা আগেই বলেছি। আ ব রা কা ডা র রা-র তাবিজ আরোগ্যের মধ্যযুগীয় আর-একটা জানিত সূত্র। সুজন সমাবেশেও এমন প্রশ্নোত্তরের সভা ছিল একধারে, নীতি ধর্মের স্থানে বিষয়ে যেখানে আমোদ, বিদ্যাবান লোকের হাতে হেঁয়ালি সেখানে হয়ে উঠত আরো কূট, আরো গূঢ়, আরো দুষ্ট প্রহেলিকা, হয়ে উঠত কারু শব্দের খেলা, তা নিয়ে তাঁরা লিখে তুলতেন কণিকার মতো উদ্ভট পদ, হেঁয়ালির ছন্দ। বিশিষ্টজনের শিক্ষণীয় চৌষট্টি কলাবিদ্যার এক কলা বলে গণ্য হয়েছিল একদা এই হেঁয়ালি-প্রহেলিকার প্রশ্ন আর পূরণ।

হালের কথা

বিদেশেও হেঁয়ালির খেলা দেখতে পাই পার্‌লার গেমের মধ্যে। কিন্তু দেশ-বিদেশের ধাঁধা-হেঁয়ালির যত সঞ্চয় আজ স্তূপিত হয়ে উঠেছে তার প্রায়টাই পুরোনো লোকস্মৃতি। লোকমুখের সে সব হেঁয়ালি-কথার উপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায় নি। "ঢ্যাঙা পায়ে ছুটে আসছে গো ধাওয়া ক'রে / তাড়াতাড়ি চল্, ঘরে উঠি যাই, চল্", কিংবা "মুখে আগুন হনুমান / লেজ দিয়ে জল পান"— এর ভেতর সাদাশুধো একটা লোকের দেখা বা অনুভব হয়তো হারায় নি। কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে হেঁয়ালির জায়গাই, বোধ হয় হারিয়েই গেছে এতদিনে। অনেক দিন টিকেছিল ছেলেদের কাগজের শেষ পৃষ্ঠায়। কিন্তু পুরোনো হেঁয়ালি ভাণ্ডারে নতুন সাজ চড়ে গেল রাতারাতি, নাম বদলে জমকালো সাইনবোর্ড পড়েছে : দি নিউ পাজ্‌ল্ স্টোর। সে আটঘাট বেশ পরে বেরিয়ে বলে, আর বলো কেন! আগে ছিল হেঁলি ধাঁধা সমিস্যে সতর-পঞ্চাশ, আর সে চলছে না রে ভাই! এখন চাই কে কী কিসে কেন কবে কোথায়, অর্থাৎ কিনা ক্যুয়িস ক্যুয়িদ ক্যুয়িদ